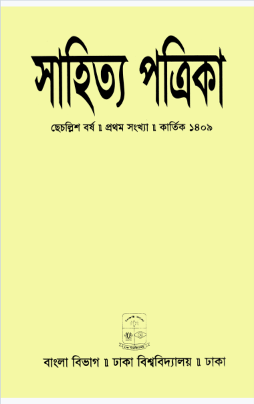

Vol. 46 | No. 1 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী আবদুল ওদুদ-সম্পাদিত "সংকল্প" পত্রিকার বিষয় ও ভাবসম্পদ

Volume	46
Issue	1
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ নূরুল ইসলাম
Published online	October 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v46i1.345
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.345
Pages	৮৮-১০৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কাজী আবদুল ওদুদ-সম্পাদি
Check for updates
পত্রিকার বিষয় ও ভাবসম্পদ

আহ্‌মদ নূরুল ইসলাম *

মুসলিম বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল লেখক কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ফদিরপুর জেলার পাংশা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৩ সনে ম্যাট্রিকুলেসান এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই, এ; এবং বি,এ. (১৯১৭) পাশ করেন। ১৯১৯ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **পলিটিক্যাল ইকোনমি** বিষয়ে এম, এ, পাশ করেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে তিনি সংস্কৃত ভাষা পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫), দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৭৯), নীরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৯৬-১৯৬৬)। তিনি কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমদের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন।[১]

কাজী আবদুল ওদুদ, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে চাকরি লাভ করেন।[২] অর্থনীতির এম. এ. পাশ ব্যক্তির সাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরি লাভ করাটা, সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পরিচয়ই বহন করে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর লিখে তিনি তাঁর প্রতিভার সে-স্বাক্ষর বজায় রাখতে পেরেছিলেন। প্রগতিশীল মুসলিম সাহিত্যের আলোচনায়, কাজী আবদুল ওদুদের নাম উল্লেখ না-করার অবকাশ নেই।

তাঁর প্রতিভার অন্য প্রকার প্রমাণও আমরা পাই তাঁর দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকার মাঝে। আমরা জানি যে, তিনি ১৯২৬ সনে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রধান কর্ণধার ছিলেন।[৩] ওই সমাজের শিখা পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও তাঁর সহযোগিতা ছিল। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘকাল ঢাকায়ই ছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারির চাকরি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কিছুদিনের জন্য তাঁর অফিস কলকাতা থেকে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অবশেষে ১৯৫১ সনে কলকাতায় থাকা কালে অবসর গ্রহণ করেন। টেক্সট বুক বোর্ডের কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হলে, মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আর প্রত্যক্ষ থাকেনি।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁর কর্ম-চেতনার একটি বিশেষ দিক হল এই যে, ১৯৪৭ সনে বৃটিশ-শাসিত ভারত-রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও, কাজী ওদুদ জন্মভূমি পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেননি। তিনি কলকাতায় থেকে গিয়েছিলেন। বৃহত্তর ভারত বিভক্ত হওয়াটাকে তিনি সহজ চোখে দেখেননি। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশও বিভক্ত হল, এটাও তার মনোজগতের সঙ্গে মেলেনি। এ-সকল কথা তাঁর একমাত্র কন্যা জেবুন্নেসাও আমাকে বলেছেন, তাঁর স্বামী অধ্যাপক শামসুল হকের ঢাকা শহরের বাসায় বসে। কাজী ওদুদ কলকাতা থেকে ১৫/৪/১৯৬৯ তারিখের এক চিঠিতে আবদুল হককে লিখেছিলেন "তা ছাড়া পাকিস্তান হবার পরে আমি পাকিস্তানকে স্বীকার করেই নিয়েছিলাম, যেমন জহরলাল প্রমুখ ভারতীয় নেতারা মেনে নিয়েছিলেন।"[৪] এ বক্তব্যের মধ্যে একটি দ্বিধা বা বিতর্ক ছিল তা তো বুঝাই যাচ্ছে।

সময়-পরিস্থিতি ও "সংকল্প" প্রকাশ

কাজী আবদুল ওদুদ ভারত বিভক্তির পরে ভারতে থেকে গেলেও তিনি পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে বৈদেশিক নীতিগত সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে চলছে, এমন মনে করতে পারেননি। সুতরাং বৃটিশযুগে ভারতরাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যে-সমস্যা ছিল, হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারত এবং মুসলমানদের জন্য স্থাপিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে সে-সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল, এমন বলার অবকাশ ছিল না। আবার পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যেও ভাবের সাজুয্য ছিল না। অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির সংঘাত লেগেই ছিল। ১৯৫৬ সনের পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রে "পূর্ব পাকিস্তান" নামকরণের আগে পাকিস্তানের পূর্বাংশ তথা আজকের বাংলাদেশ "পূর্ববঙ্গ" নামেই পরিচিত ছিল। এমন কী, ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও কমিউনিষ্ট পার্টির কোন কোন শাখা বাংলাদেশকে "পূর্ববঙ্গ" বলেই অভিহিত করত।

কাজী আবদুল ওদুদ কলকাতায় বসে এ-জাতীয় সম্প্রদায়গত এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু কাজ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ওই জাতীয় কাজের অন্যতম হল ১৩৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) কলকাতার ৮, বি, তারকদত্ত রোড থেকে, তথা তাঁর নিজের বাড়ি থেকে "সংকল্প" পত্রিকা প্রকাশ করা।[৫]

কাজী ওদুদের পত্রিকা সংক্রান্ত মনোভাব ও কর্মধারা আলোচনা করার আগে তাঁর প্রথম জীবনের পত্রিকা সংশ্লিষ্টতার পরিচয় গ্রহণ করা দরকার। কারণ সাময়িক পত্রিকা বিষয়ে তাঁর মনোভাবে পরিচয় গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে। ১৯২৬ সনে মুসলিম সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই, ১৯২৫ সনে অধ্যাপক আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮) ঢাকা থেকে *তরুণপত্র* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এবং *শিখা, অভিযান, জয়তী. বুলবুল* প্রভৃতি পত্রিকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের ভাবধারা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল। 'শিখা' ছিল সাহিত্য সমাজের নিজস্ব মুখপত্র। অপর পক্ষে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকা, সোলতান পত্রিকায় সাহিত্য সমাজের ভাবধারাকে সমালোচনা করে রচনা প্রকাশ করা হত।

১৯৪৭ সনের পরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়ে রচনা প্রকাশ করত। সে-সব রচনার পরিচয় উক্ত পত্রিকার পৃষ্ঠায়ই বর্তমান রয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ এ-সব সাম্প্রদায়িকতায় ব্যথিত হতেন; কারণ তিনি, নিজে সাম্প্রদায়িক কারণে ভারত-বিভক্তি পছন্দ করেননি। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে একই অখণ্ড ভারতের নাগরিক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তবে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি আস্থাবান ছিলেন। ওই সময়ে তিনি নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি থেকে মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এ-ভাবধারা প্রচারের জন্যই তিনি কলকাতা থেকে "সংকল্প" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন (১৩৬১)। এ-বিষয়ে আবদুল কাদির বলেন: "ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন ও 'শিখা গোষ্ঠী প্রধানত তাঁরই (ওদুদ) চিন্তা ও প্রেরণা থেকে পেয়েছিল প্রাণ-পাথেয়; পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ একটি ভাবান্দোলন ও লেখক-গোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল তাঁর 'সংকল্প' প্রকাশের কারণ। তবে একালের কর্মীদের শ্লোগান হবে: সংকল্প, শৃঙ্খলা, সংগ্রাম। সংকল্প অর্থ: নিরাসক্ত বুদ্ধি ও অতন্দ্র জ্ঞানের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি ও সেই সত্যে সমর্পিতচিত্ততা। শৃঙ্খলা অর্থ: সকল উগ্রতা উদ্দামতা সংস্কার স্বার্থ ও মোহ বিসর্জন দিয়ে প্রেম ও কল্যাণের পথে অকম্প পদক্ষেপ। সংগ্রাম অর্থ: উপলব্ধ সত্যকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপ দানের জন্য নিরলস চেষ্টা।"[৬] সংকল্প পত্রিকা ১৩৬১ বঙ্গাব্দে বের হয়েছিল মোট সাত সংখ্যা এবং ১৩৭২ (১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গাব্দে মোট দুই সংখ্যা; মোট নয় সংখ্যা মাত্র।

অপর পক্ষে কাজী আবদুল ওদুদ, কথিত ৮, বি, তারকদতত্ত রোডের নিজের বাড়ি থেকেই ঢাকার 'তরুণপত্র' নবপর্যায়ে বের করেন, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে। এই পত্রিকারও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন, কাজী আবদুল ওদুদ। সম্পাদনা পরিষদে আরও ছিলেন: রবীউদ্দীন আহমদ (সহ-সভাপতি), নারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক উজ্জ্বল মজুমদার, নূরুল ইসলাম মোল্লা, শরাফত আলী, অজয় সিংহরায়।

দুটি পত্রিকাই ডিমাই $\frac{১}{৮}$ সাইজে প্রকাশিত হত। কোনো পত্রিকারই আর্থিক সঙ্গতি ভাল ছিল না। সরকারী বিজ্ঞাপন কোনো পত্রিকার ভাগ্যেই জুটেনি।[৭] স্বল্প কয়েকটি বিজ্ঞাপন 'সংকল্প' পত্রিকা পেয়েছিল। তবে বিজ্ঞাপনের অবস্থা দেখেই বোঝা যায় যে, ওগুলো ছিল, স্বল্প মূল্যের বিজ্ঞাপন। নবপর্যায়ের তরুণপত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপনও সংখ্যায় বেশি ছিল না। এবং মূল্যমানও ছিল কম।

সংকল্প পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল এরূপ: ১ম সংখ্যা–৪৬; ২য় সংখ্যা–৫৬; ৩য় সংখ্যা–৪৯; ৪র্থ ও ৫ম (যুগ্মসংখ্যা)–৮০; ৬ষ্ঠ সংখ্যা–৬৪; ৭ম ও ৮ম (যুগ্ম) সংখ্যা–৮৪; ৯ম-১২শ (যুক্ত) সংখ্যা–১৪৬; বর্ষশেষ সংকলন সংখ্যা-৬০ পৃষ্ঠা (একটি সংখ্যা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি)। বর্ষশেষ সংখ্যার সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন তিনজন— কাজী আবদুল ওদুদ, রবীউদ্দীন আহমদ, এবং নারায়ণ চৌধুরী।

'সংকল্প' পত্রিকায় সাধারণত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও পুস্তকসমালোচনা বিভাগ প্রকাশিত হত। সম্পাদকীয় বিভাগের শিরোনাম ছিল "যা ঘটছে"। নামে বিভাগটি গুরুভার না-হলেও, এর বৃত্তটি ছিল ব্যাপক। এই বিভাগে চলমান ঘটনার সূত্রধরে দেশ-জাতি ও আর্ন্তজাতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ধারণ করা হত। যে-কোনো পত্রিকাই একটি নীতির ধারক হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে থাকে এবং নিজস্ব সেই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। তার সকল প্রকার লেখায় সাধারণত ওই মতের প্রতিফলন ঘটে থাকে। 'সংকল্প' এবং নবপর্যায়ের 'তরুণপত্র' পত্রিকাও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

আমাদের সংগৃহীত সংকল্প পত্রিকার আটটি সংখ্যায় মোট ১৭টি গল্প, ৩৭টি কবিতা, ১টি অনুবাদ কবিতা, এবং অন্য পত্রিকা থেকে ৪টি সংগ্রহ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল ২৭টি। 'যা ঘটছে' বিভাগে আলোচিত বিষয়ের সংখ্যা ছিল ৪০টি। ১৬টি পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল সংকল্প পত্রিকার ৮টি সংখ্যায়।

'সংকল্প'-এ প্রকাশিত গল্প

আমরা প্রথমে সংকল্প পত্রিকার গল্প নিয়ে আলোচনা করতে পারি। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত সতেরটি গল্পের মধ্যে ইন্দুমতি ভট্টাচার্যের 'দুর্বোধ্য"[৮] গল্পটির বিষয়বস্তু রোমান্টিক। অন্য সব গল্পই সমাজ-বাস্তবতা ঘনিষ্ঠ। ওই সব গল্পে, নিম্নবিত্তের মানুষের অভাব, দারিদ্র্য, জীবন-সংগ্রাম এবং মনুষ্যত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। ভারত বিভাগের প্রতিক্রিয়া কী ভাবে, মানুষের জীবনে ছায়াপাত করেছে, তাও রূপলাভ করেছে সংকল্প পত্রিকার কোনো কোনো গল্পে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার[৯] "বিসর্পিল' গল্পটি তেমনি একটি গল্প। গল্পটির লেখক "শ্রীধর খাসনবিশ" নামটিই প্রমাণ করে এটি ছদ্মনামে লিখিত। গল্পটি, ১৩৬০ সনের আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত রাণু ভৌমিকের "বিসর্পিল" গল্পের উপসংহার হিসেবে লিখিত। সেকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় হিজরতকারী একটি পরিবারের এক তরুণী তপতী। তপতীর বাবা সুবোধ বাবু ছিলেন পূর্ব বাংলার পদ্মার পাড়ের কোনো এক অঞ্চলের অর্থসম্পন্ন গৃহস্থ। তার পরিবারকে সাম্প্রদায়িক কারণে ভারতে চলে যেতে হয়। তপতী কলকাতার একটি অফিসে চাকরি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অল্প দিনেই সে বুঝতে পারে যে, "আত্মার মৃত্যু না-ঘটিয়ে" চাকরি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার অন্য উপায় ছিল আত্মহত্যা করা। প্রবাসী পত্রিকার গল্পটিতে রাণু ভৌমিক তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু কাজী ওদুদের সংকল্প, পত্রিকার 'বিসর্পিল' গল্পের লেখক শ্রীধর খাসনবিশ, তপতীকে সে-পথে না-নিয়ে জীবন সংগ্রামী করে তুলেছেন। এখানে সংকল্পের গল্পকার জীবনমুখী। তপতীর এ ধরনের জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনই হতনা, যদি না তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হত।

'বিসর্পিল' গল্পে আমার যা পেয়েছি, তার বাস্তব ঘটনা আমার পূর্ব বাংলায় বসে তথা তৎকালের পূর্বপাকিস্তানে বসে বাস্তবেও দেখতে পেয়েছি। তা হল কবি মেহেরুন্নেসার (১৯৪০-২৭ মার্চ, ১৯৭১) জীবন কাহিনী। অধ্যাপিকা হাফিজা বেগম তাঁর সম্পাদিত "মেহেরুন্নেসার জীবন ও কাব্য সংগ্রহ" গ্রন্থে ঐ বিষয়ে লিখেছেন: "দেশ বিভাগের পর দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিবার হিসাবে মেহেরুন্নেসার পিতা আবদুর রাজ্জাক সাহেব ১৯৫০ সালে ঢাকায় আসেন। কলকাতায় ভাওয়ানীপুরে এবং কালীবাজারে যথাক্রমে তাদের জুতা এবং কাপড়ের দোকান ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তা পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলা হয়। ফলে প্রচুর অর্থ লালিত রাজ্জাক সাহেব

ঢাকায় রিফুজী হিসাবে পরিচিত হলেন।"[১০] উল্লিখিত মেহেরুন্নেসা রাজ্জাক সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা। তিনি কিছুদিন ফিলিপস কোম্পানীতে চাকরী করেছেন; কিছুদিন ঢাকার বাংলা একাডেমীতে লেখা কপি করার কাজ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, ১৯৫৪ সন থেকে, ১৯৭১ সনের ২৩-এ মার্চ সংখ্যা বেগম পত্রিকায়।[১১] এই বাস্তবের জীবন্ত, (কলকাতা থেকে আগত), রিফুজী কবি মেহেরুন্নেসা, ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে, ২৭-এ মার্চ শনিবার, ঢাকা শহরের মিরপুরে স্বাধীনতা বিরোধী বিহারীদের হাতে নিহত হয়েছেন।[১২]

সুতরাং ভারত বিভাগের পরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত ও পাকিস্তানে প্রচুর হয়েছে এবং এজন্য সৃষ্টি হয়েছে রিফুজি সমস্যা। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধকালের বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধও রিফুজি সমস্যাজাত। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা এবং ভারত থেকে মুসলমানরা পাকিস্তানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, এটি ইতিহাসের সত্য। সংকল্প পত্রিকার গল্পগুলোর পটভূমি কলকাতা শহর অথবা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

সংকল্প পত্রিকায় নবীন লেখক আবদুল জব্বার লিখেছিলেন চারটি গল্প। আড়বাঁশী[১৩], বদলী ওয়ালা[১৪], কণ্টিকারী[১৫], এবং পুণ্যদা[১৬]। আড়বাঁশী গল্পে বাস্তবের মধ্যে আছে রোমাণ্টিকতা। তের শ পঞ্চাশ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে বাগদী সম্প্রদায়ের 'সুন্দর' নামের কিশোরের বাবার মৃত্যু হয়। এবং তার মা ও বোন যায় হারিয়ে। সে রামহরির হোটেলে পেটে-ভাতে ঠাঁই নেয়। তার সখ আড়বাঁশী বাজানো। হোটেলের কাজে তার বেশি দিন চলেনি। সে কখনো কুলিগিরি করে, কখনো খেয়া নৌকা চালিয়ে জীবিকার সংস্থান করতে থাকে। কিন্তু মন তো জীবিকার বৃত্তে বাঁধা থাকেনা। তার মনে ধরে তারই সম্প্রদায়ের মলিনাকে। মলিনাকে বিয়ে করার জন্য, মলিনার মায়ের দাবী মতে সুন্দর দুই কুড়ি টাকা জোগার করে। কিন্তু তার আগেই মলিনার মা, মলিনাকে চার কুড়ি টাকার বিনিময়ে বুড়ো নিতাই সর্দারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। সুন্দর দুঃখ-ক্ষোভে চলে যায় শহরে। বুড়ো স্বামীর মৃত্যু হলে মলিনা, বিধবা হয়ে ফিরে আসে মায়ের সংসারে। যুবতী নারীর বিধিলিপি আক্রান্ত করে মলিনাকেও। এক দিকে সুন্দরের প্রেমময় দৃষ্টি পাহারা দিয়ে ফিরে মলিনাকে। অপর দিকে প্রতাপশালী দুর্লভ বাবু মলিনাকে অপহরণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তার আগেই সুন্দর তাকে নিয়ে চলে যায় নিরাপদ স্থানে। গল্পের বিষয় গতানুগতিক রোমাণ্টিক হলেও, বাগদীপাড়ার ভাষা ও জীবনচিত্র ভালোই ফুটেছে লেখকের হাতে।

বদলিওয়ালা ও কণ্টিকারী গল্পও নিম্ন তথা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের গল্প। রহমান 'বদলী' গল্পের নায়ক। সে কারখানায় কখনো বদলী শ্রমিকের কাজ পায় আবার কখনো পায় না। তার স্ত্রী কাজলী ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে ধর্না দিয়েও রিলিফ পায় না। অথচ রহমানকে মা এবং সন্তানসহ পুরো পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। এই বেঁচে থাকার জন্যই তারা মিলে বা কারখানায় যায়; কাজের জন্য সহ-শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, মারামারি করি। শত্রুতাও করে। আবার সহমর্মীতায় একত্রও হয়। সাধারণ মানুষের এ-সকল চিত্র সেকালের মানুষের জীবনচিত্র বলে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই পত্রিকায় ঠাঁই পেত। কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে কাজী আবদুল ওদুদের জীবন-দৃষ্টি কিছুটা সাধারণ মানুষ ঘেষা ছিল। সেজন্যই তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় ওই জাতীয় গল্প সহজে ঠাঁই করে নিতে পেরেছিল।

'কণ্টিকারী' গল্পের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে নারী মনস্তত্ত্ব একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। নগেন অতি দরিদ্র। সে তার বউকে নিত্য মারধর করে। অথচ সে পালিয়ে যায় না। কিন্তু জবেদের বউ একদিন স্বামীর চড় খেয়েই পালিয়ে যায়। এ-ঘটনায় নগেনের মনে একটা দাগকাটে। সে তার স্ত্রীর মানবিক বোধের মর্যাদা বুঝতে পারে। তার বউয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। নারী-যে সহনশীলা একথা নগেন বুঝতে পারে। জবেদের বউ যে ব্যতিক্রম তাও সে বুঝতে পারে। এখানে নগেনের চেতনার যে-বিবর্তন হয়েছে, তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক হিসেবে প্রেমের প্রতি কাজী ওদুদের একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল। সম্পাদনা কাজে তিনি তা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। গল্পটির তাৎপর্য তার নামকরণের মধ্যে। 'কণ্টিকারী' হল কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ যার থেকে আয়ুর্বেদীয় তথা কবিরাজী মতে ঔষধ তৈরী হয়। সাধারণভাবে কণ্টিকারী অর্থে কাঁটাওয়ালা ওই গাছকেই বুঝায়। এর কাঁটা খুব সূঁচালো, এবং তীক্ষ্ম বেদনা সৃষ্টিকারী। নারী-যে কণ্টিকারী হতে পারে, জবেদের বউয়ের আচরণ দেখে নগেন তা বুঝতে পেরেছিল।

আবদুল জব্বারের 'পুণ্যদা' হল পূর্ণচন্দ্র, অন্নদা, এবং কুসুমের মত অতিসাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী। লেখকের ওপরের চারটি গল্পের সঙ্গে 'বুভুক্ষা' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত করে মোট পাঁচটি গল্প দিয়ে 'বুভুক্ষা' গল্প সংকলন প্রকাশ করেছিল সংকল্প প্রকাশনী, তথা কাজী আবদুল ওদুদ। বুভুক্ষা গ্রন্থের সমালোচনায় বলা হয়েছে; "আবদুল জব্বার তরুণ লিখিয়ে। লিখছেন বছর দুয়েক ধরে। এরই মধ্যে তাঁর লেখা কিছু পাঠকের চোখে পড়েছে। বজবজের কলকারখানা অঞ্চলে তাঁর বাড়ী। তার জন্ম গতর খাটিয়েদের বংশে। এই বয়সেই হা-ঘরে এবং

হাভাতেরদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে তাঁর যে-পরিচয় হয়েছে আর তাঁর কলমের আগায় সে সব মাঝে মাঝে যেভাবে ফুটেছে তা অনন্য সাধারণ।"[১৭] সমালোচকের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরাও একমত। মানুষ নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই অনেক সময় প্রথম লেখা শুরু করে। 'বুভুক্ষা'ও আবদুল জব্বারের প্রথম গল্প গ্রন্থ। তাই তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাতে রেখাপাত করবে, এটাই স্বাভাবিক।

সংকল্প পত্রিকায় আরও গল্প ছাপা হয়েছে। অমরেন্দ্র ঘোষের 'জী হৌজুর'[১৮] মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সিন্ধু' গল্প, দুটি প্রায় একই রূপ জীবনচিত্র। প্রথম গল্পের মহাদেও গরীব কৃষক। তার স্ত্রী লছমী। তাদের দুধেল গাভী জমিদারের কারসাজিতে চুরি হয়ে গেলে, তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। জমিদার সে ছুঁতোয় লছমীর প্রতি হাত বাড়ায়। মহাদেও ও লছমী গ্রাম ছেড়ে গিয়ে কুলির কাজ করতে থাকে। সেখানেও কুলির সর্দার লছমীর প্রতি দৃষ্টি দেয়। তারা কাজে বের হয়ে পড়লে অসহায় অবস্থায় তাদের ছেলে শ্রীপৎ-এর মৃত্যু হয়। তাদের এই দুর্দিনে তারা মিলে স্থায়ী শ্রমিক হিসেবে চাকরি পায়। গল্পের এ প্রতিপাদ্য চিরকালের মানবতার প্রচার মূলক-মানুষ এক সময় মনুষ্যত্বের আশ্রয় পেয়েই থাকে।

'সিন্ধু' মুরারীমোহনের ওই নামের গল্পের নায়িকা। স্বামী মানিকলালের মৃত্যু হলে সিন্ধু দুই পুত্র-সন্তান নিয়ে কুলির কাজে যোগ দেয়। তার একপুত্র বই পড়তে চেষ্টা করত। মায়ের ভয়ে সে লুকিয়ে বই পড়ত। তার অন্যভাই একদিন সে কথা মা সিন্ধুকে বলে দেয়। সিন্ধু লেখাপড়ার প্রতি বিলাসিতায় আসক্ত ছেলেকে মারধর করে। জীবন বোধের চেয়ে জীবিকা-যে মানুষের কাছে আপাত বেশি মৌলিক, এ প্রমাণ দিতে লেখক চেষ্টা করেছেন।

কাজী ওদুদ সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাস 'নদীবক্ষে"[১৯]। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায়ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে লিখিত গল্পেরই প্রাধান্য। অথবা ভারত-বিভক্তির ফলে অখণ্ড ভারতের জীবনে যে বিচলন শুরু হয়েছিল তার চিত্র তিনি তাঁর পত্রিকায় ঠাঁই দিতে চেয়েছিলেন। এরকম তিনটি গল্প হল, আবদুর রউফের স্বাধীনতা[২০], শেখ সাবের আলীর 'প্রশ্ন'[২১], এবং মাহমুদুল হকের 'পটভূমি'[২২]। এ তিনটি গল্পের বিষয়ও সমাজ-সংঘর্ষের ঘটনা। স্বাধীনতা গল্পের কথক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে মিছিলে গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এই হল তার কাছে স্বাধীনতা চাওয়ার অনুভূতি। স্বাধীনতার পরেও সে না-জোটাতে পারে চাকরি,

ঘুষখোর পুলিশের জ্বালায় না-পারে চোরাকারবারী হতে। যে-নেতারা তাকে কাজে খাটিয়েছিল, তাদের নিকটে গিয়ে না-পারে কোনো ব্যবসার লাইসেন্স যোগাড় করতে। প্রশ্ন গল্পের নায়ক চাকরি যদি বা পেল. বেতন মাসে মাত্র ষাট টাকা। অথচ তারই পূর্বের কর্মচারী ওই একই পদে বেতন পেত তিন শ টাকা। কারণ সে ইংরেজী জানত। স্বাধীন দেশে স্বাধীন দেশের ভাষার তুলনায় ইংরাজির প্রাধান্যই বেশি বিবেচিত হল! এহ বাহ্য। বেশি বেতন পাওয়ার জন্য সে প্রাণপণে ইংরেজি শিখতে শুরু করে। তাতেও তার বেতন বাড়েনা। অতঃপর সে গ্রহণ করে প্রতারণার পথ। সে তার ওপরওয়ালাকে বলে, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন নিয়ে তার সংসার চলে না। তাই সাহেবের করুণা যাঞ্চা করে সে তার বেতন বাড়িয়ে নেয়। অথচ সে আদৌ বিবাহিত নয়। তার এ-প্রতারণা তার নিজের মধ্যেই যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। সে মিথ্যে বলার গুণার ক্ষমা পাওয়ার জন্য নিত্য কোরআন শরীফ পড়ে। গল্পটি বাস্তবতা স্পর্শকারী: তবে নীতির প্রতি লেখকের আবেগ একটু বেশি বলেই মনে হয়।

পটভূমি গল্পে নৈতিক সংগ্রামের ইঙ্গিত আছে। সৎ-শিক্ষক জনৈক চৌধুরী সাহেবকে, স্কুলের হেডমাস্টার সহকারী হেডমাস্টার এবং অন্যান্যরা ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুযোগসন্ধানীদের মত ফাঁকিবাজ করে তুলতে না-পেরে, তুচ্ছ অজুহাতে চাকরিচ্যুত করে। 'সৎ-শিক্ষক' নীরবে তাঁর শহরে চলে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তাঁর কাছেই সকল কাজে সৎ থাকবার দীক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা তাঁকে সম্মত করায় প্রতিবাদ করার জন্য। সৎ লোকেরা প্রায়ই নীরবে পরাজয় বরণ করে নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবাদটিই হল প্রতিবাদের 'পটভূমি'।

স্বাধীনতা, প্রশ্ন, পটভূমি, তিনটি গল্পই জীবনকে আদর্শায়িত করার গল্প। সাধারণ মানুষের জীবনের এ-সকল গল্প শিল্পরূপও মন্দ হয়নি। তবে ব্যতিক্রম হল আবুল ফজলের গল্প 'সিতারা'[২৩] রূপবিন্যাসের দিক দিয়ে সংকল্প পত্রিকার অন্যান্য গল্পের তুলনায় আলাদা। 'সিতারা' গল্প ১৩৭১ বঙ্গাব্দে আবুল ফজলের 'শ্রেষ্ঠগল্প' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।[২৪] অধ্যাপিকা ড. খালেদা হানুম বলেছেন 'সিতারা' প্রথমে 'রূপ ও রূপেয়া' নামে প্রকাশিত হয়েছিল[২৫]; কিন্তু তিনি উৎস নির্দেশ করেননি। সংকল্প পত্রিকার পাঠ মতে 'সিতারা' গল্পকে আমরা এভাবে পাই: সিতারার গর্ভধারিনী মা মন্নুজান একজন বাইজী। খানবাহাদুর এম, এ, মতিনের ঔরসে সিতারার জন্ম হয় মন্নুজানের গর্ভে। তা গোপন থাকে দীর্ঘকাল। সিতারার বিয়ে হয় আরশাদের সঙ্গে। একদিন আরশাদ জানতে পারে এম, এ, মতিনের অবৈধ সন্তান হল সিতারা। আরশাদ গোপন সংবাদ প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে

এম, এ, মতিনের সব সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিতে চায়। সিতারা এ ঘটনার বিরোধী হয়ে ওঠে। সে নিজের মানবিক মর্যাদাকেই বড়ো করে দেখে। সে আরশাদের মত বিষয়নিষ্ঠ অমানুষের কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করে, আরশাদকেই রাস্তায় বের করে দেয়। এগল্পে মুসলিম উচ্চবিত্তের সামাজিক অবস্থা ও সিতারার আত্মমর্যাদাকেই তাৎপর্যময় করা হয়েছে। ড: খালেদা হানুম সিতারার মা মন্নুজানের চরিত্রকেই উজ্জ্বলতর বলে অবহিত করেছেন।[২৬] আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে সিতারার চরিত্র দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়ী।

সংকল্প পত্রিকার গল্পগুলো বাস্তব ঘেষা তবে মানবতার সুরটি শিল্পবোধের চেয়ে বেশি চড়া। এমন কি তপতী সেন একটি গল্প লিখেছিলেন; নাম "বাস্তব"। ওটি ঠিক গল্প হয়নি বলে সম্পাদক ওটিকে "আলেখ্য" নামে চিহ্নিত করে প্রকাশ করেছেন।[২৭] কাজী ওসমান গণিও একটি গল্প লিখেছিলেন, নাম 'শরীফ ঘর'। সম্পাদক ওটিকে 'সমাজচিত্র' অভিধা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।[২৮] এ ধরনের লেখা প্রকাশের পেছনে, সম্পাদকীয় নীতিতে শিল্প-চেতনার তুলনায় সমাজচিন্তা ও লোকহিতৈষণা প্রবল ছিল তা বলা আবশ্যক।

সংকল্পে প্রকাশিত কবিতা

সংকল্প পত্রিকার গল্পগুলোতে সমাজচিন্তা ঠাঁই করে নিতে পারলেও, ওই পত্রিকার কবিতার কেনো বৈশিষ্ট্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্যারেনি। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো কবিতাই কোনো অর্থে আমাদের কাছে কবিতা মনে হয়নি। কবিতা লেখকদের মধ্যে লতিফা রশীদ তখন উঠতি লেখিকা ছিলেন। দীপ সেন, কাজী আকরাম হোসেন, আবদুর রাজ্জাক, খোন্দকার মাসুদার রহমান, মহম্মদ খলিলর রহমান, আনোয়ার, এধরনের অতি নতুন বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যহীন লেখকদের লেখা দিয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরানো হত। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি কলকাতা শহর থেকে পত্রিকা বের করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ কি বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কারো কাছ থেকেই একটি কবিতা আদায় করতে পারেননি? পাঠক সমাজে পত্রিকাটি আদৃত না হবার এটিও একটি কারণ। সম্পাদক বর্ষশেষ সংখ্যায় (পৌষ-চৈত্র, ১৩৬১), বলেছেন যে, ১৩৬২ সনে পত্রিকা বের হবে কি না, তা নির্ভর করছে গ্রাহক সংখ্যার ওপরে। যদি ৫০০জন গ্রাহকও পাওয়া না যায়, তবে পত্রিকা চালানো সম্ভব হবেনা।[২৯]

সংকল্পে প্রকাশিত নাটিকা

সংকল্প পত্রিকায় কাজী আবদুল ওদুদ বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল রচনা প্রকাশ করেছেন। তিনি ওই পত্রিকায় নাটক এবং প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। আবদুর রাজ্জাকের পঞ্চাঙ্কের নাটক 'পলৌবা' প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ সংখ্যা থেকে ১৩৬১ সনের কার্তিক-অগ্রহায়ণের যুক্ত সংখ্যা পর্যন্ত-মোট পাঁচ সংখ্যায়। মতবাদ প্রকাশ ও সমাজ হিতৈষণা প্রচারই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তার প্রমাণ মেলে পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচন ও 'যা ঘটছে' নামের সম্পাদকীয় বিভাগের লেখা থেকে। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে ছিলেন অন্নদা শঙ্কর রায়, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ স্বয়ং।

সংকল্পে প্রকাশিত প্রবন্ধ

অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ লিখিত প্রবন্ধের নাম এরূপ: 'ভাষার লড়াই'- জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১; 'আমাদের ভবিষ্যৎ'- শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬১; 'আমেরিকা-রাশিয়া-ভারতবর্ষ'- আশ্বিন-১৩৬১; 'শান্তিনিকেতনে কেন থাকি'- পৌষ-চৈত্র ১৩৬১ সংখ্যায়। তিনি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকার মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'ভাষার লড়াই' প্রবন্ধের পুনশ্চও লিখেছিলেন (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬১ সংখ্যায়)। ভাষার লড়াই প্রবন্ধে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন যে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকেও ইংরেজির স্থলে হিন্দি, মারাঠী, কর্ণাটকী প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত করা যায়। এর জন্য রোমান বা দেবনাগরী হরফ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রস্তাবের সপক্ষে তিনি সুইজারল্যান্ডের উদাহরণ দিয়েছেন,- যেখানে একই সঙ্গে ফরাসী, জার্মান ও ইতালিয়ান, এই তিনটি রাষ্ট্রভাষা চালু আছে। আমাদের ধারণা যে, এ বিষয়ে তিনি হয়ত লক্ষ্য করেননি যে, সুইজারল্যান্ড শিক্ষায় এবং আর্থিক সঙ্গতিতে অনেকখানি উন্নত জীবনমান অর্জন করতে পারার কারণে, বহু ভাষা আয়ত্ত করার অবস্থায় পৌছতে পেরেছে, ভারতের অবস্থা (প্রবন্ধ লেখারকালে) সে স্তরের ছিল না। 'আমাদের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি শুধু ভারতের কথাই বিবেচনা করেননি, তিনি লক্ষ্য রেখেছেন ১৯৪৭ পরবর্তী ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতি প্রকৃতির ওপরেও। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: ভারত জাতীয়তাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে সে নিজেই একটি শৃঙ্খলা; পাকিস্তান হল বিশ্ব-ইসলাম নামক একটি বিশেষ শৃঙ্খলার অংশ-

যা মরোক্ক থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকিস্তান একটি বিশেষ শৃঙ্খলার অংশ বলে ওই দেশটি স্যেকুলার হতে পারছে না। স্যেকুলার না-হয়ে ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে তার কোনো সমস্যার সমাধান হবে না।' তিনি আরও বলেছেন, "পাকিস্তানের জনগণ ক্রমে এসব বুঝবে। তার আগে অনেক দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে যাবে।"[৩০] পাকিস্তান সম্পর্কে অন্নদা শঙ্কর রায়ের কথিত কথাগুলো-যে কত অভ্রান্ত ছিল, তা পাকিস্তানী রাজনীতির ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন থেকে ১৯৫৮ সনের সামরিক শাসন, ১৯৬৫ সনের পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধ, ১৯৬৭ সনের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সনের পূর্ব পাকিস্তানের গণ আন্দোলন, ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনায় বুঝা যায়। এর জন্য শুধু বাঙ্গালীদের রক্ত দিতে হয়নি, পাকিস্তানকেও অশেষ মূল্য দিতে হয়েছে। ওই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছিলেন, "ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। স্যেকুলার স্টেট। এ রাষ্ট্রে হিন্দু কে আর মুসলমান কে আর খ্রীস্টান কে তা আইন আদালত, আপিল, আপিস, আর্মি, মিল ফ্যাক্টরি, ডকইয়ার্ড ইত্যাদি কোন খানেই খোঁজ করা হয়না, যদি হয় তবে তা হবে কন্‌স্টিটিউশন বিরুদ্ধ।"[৩১]

অন্নদা শঙ্কর রায়ের ওপরের বক্তব্য বিষয়ে আমরা কখনোই সম্পূর্ণ একমত হতে পারিনি। ভারতে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা কম হয়নি। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের রাজনৈতিক দল বিজেপির মাধ্যমে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ্য রূপ নিতে শুরু করেছে। নতুন শতাব্দী একবিংশতেও তার রূপ রূঢ় হওয়া ছাড়া নমনীয় হতে আমরা দেখছি না। ভারতের শাসনতন্ত্রে স্যেকুলারিজমের যে-বাণীই থাক না কেনো, বাস্তব অবস্থা বিপরীত। বড় প্রতিবেশীর বড় গুণ ভারতের আচরণে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সংকল্প পত্রিকার ১৩৬১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "পাক-ভারত সম্বন্ধ" প্রবন্ধ লিখেছেন আবদুর রউফ। তিনি লিখেছেন, "নৈতিক ধর্ম পৃথিবীতে এক। আনুষ্ঠানিক ধর্ম বহু। নৈতিক ধর্মকে ভিত্তি ধরে রাষ্ট্র গঠিত হইলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও পৃথিবী ব্যাপী একরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে।" তাঁর এ স্যেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি নীতিগতভাবে সমর্থিত হতে পারে; বাস্তব রূপ লাভকরা বড়ই কঠিন। কারণ সুগঠিত মনুষ্য চরিত্র প্রাপ্তির জন্য আমাদেরকে আরও শিক্ষাসম্পন্ন এবং দারিদ্র্যমুক্ত হতে হবে- যা আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও আশা করা কঠিন। প্রবন্ধকারের সমকালেও ভারতের দিকে তাকিয়ে লেখকের কথা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না, যখন তিনি বলেন, "হিন্দুর বর্ণভেদকে মুসলমান নিন্দা

করে। হিন্দুর বর্ণভেদ অপেক্ষা মুসলমানের ধর্মভেদ তথা শিয়া ও সুন্নি, আহম্মদী ও মোহাম্মদী, হানাফি ও লা মজাহাবী অধুনা উর্দূভাষী বাংলাভাষীর লড়াই কি কম মারাত্মক? তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার হাতে খাইলে না, আর একজন আমাকে ঘৃণা করিয়া আমাকে হত্যা করিল, কোন্‌টা বেশী মারাত্মক?" এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের বক্তব্য: দুই রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অধিক তা অস্বীকার করা যায় না; কারণ তারা সংখ্যায় গুরু ও শিক্ষায় মুসলমানদের তুলনায় অগ্রগণ্য।

অন্নদাশঙ্কর রায় "আমেরিকা রাশিয়া ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে (আশ্বিন ১৩৬১) বলেছেন: আমেরিকায় লিবার্টি নিয়ে বিপ্লব হয়ে গেছে, প্রপার্টি নিয়ে হয়নি– যা হয়েছে রাশিয়ায়। ভারতে একরকম লিবার্টি নিয়ে বিপ্লব হয়েছে– কিন্তু আমেরিকা যত সহজে প্রপার্টি নিয়ে বিপ্লব থামিয়ে রাখতে পেরেছে ভারত তত সহজে তা পারবে না।" কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ভারতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের চেয়ে প্রতিবেশী ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সঙ্কটেই বেশি জড়িয়ে পড়েছিল। এবং সে সঙ্কটের জের হিসেবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ভারতের রাজনৈতিক সঙ্কটের পেছনে অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রভাব থাকলেও আমাদের বিশ্বাস তার রাজনৈতিক সঙ্কট এড়িয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট বড় হয়ে উঠবে না। ভারত শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণায় অনেক দূর এগিয়ে গেলেও রাজনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এখনও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত প্রীতি যথেষ্ট সুন্দর হয়ে উঠেনি।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে, আর একটি প্রবন্ধ হল "বেচুয়ানাল্যান্ড ও বহির্বিশ্ব' (সঙ্কল্প: বর্ষশেষ সংখ্যা ১৩৭২)। লেখক: নাওমি মিচিসন। প্রবন্ধটি কোন ভাষায় রচিত, এর বাংলা অনুবাদ কে করেছেন, অথবা মূল লেখকের পরিচয় কি তা পত্রিকার কোথাও লিখিত হয়নি। ওই প্রবন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে-আশা করা হয়েছিল তার ফল দীর্ঘদিনেও তেমন শুভ হয়নি। তবে বহু পরে নেলশন ম্যাণ্ডেলার ক্ষমতা গ্রহণের পরে দক্ষিণ আফ্রিকার শুভ দিনের শুরু হয়েছে-বিংশ শতাব্দির নব্বইয়ের দশকে।

'খুড়োর পাকিস্তান' (সংঙ্কল্প, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৬১) একটি রূপক প্রবন্ধ। লেখক আবদুর রউফ ওই প্রবন্ধে পাকিস্তান বিষয়ে যা-বলেছেন, তা প্রায় ফলে গিয়েছে, পাকিস্তানের বিষয়ে। লেখক একটি রূপক কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হতে গিয়ে বৃহৎ

বাংলাকে এমন এক পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে যে, অমন পাকিস্তান টিকে থাকতে পারেনা। এ-বিষয়ে ভাই পো ও খুড়োর কথোপকথন এরূপ:-

"ভাই পো: পাকিস্তানের পরে আবার কে আসবে?

খুড়ো: মনে হয় হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ চরমে উঠিয়ে দিয়ে এদের পুনর্মিলন ঘটাতেই এসেছে পাকিস্তান।

ভাই পো: অর্থাৎ?

খুড়ো: অর্থাৎ এমন একদিন আসবে যেদিন হিন্দুয়ানী মুসলমানীতে মানুষের বিরক্তি ধরে যাবে।"

কিন্তু ১৯৭১ সনে পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলেও হিন্দুয়ানী এবং মুসলমানীতে কারো বিরক্তি ধরেছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত: ভারতীয় হিন্দুর তথা দিল্লীর শাসকদের অসহযোগিতার ফলে, ছিটমহল ও সমস্যা, অবাধ চোরা চালান, প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলে বাঙ্গালী তথা বাংলাদেশী মুসলমানেরা ভারতের ওপরে আস্থা রাখতে পারছে না।

সংকল্পের প্রবন্ধসমূহে সমসাময়িক বিশ্বরাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে, পাকিস্তান-ভারত ও বহির্বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে, তেমনি পাকিস্তান-ভারতের তথা উপমহাদেশীয় সমাজের ধর্ম-ইতিহাস ও সংস্কৃতিগত অবস্থা কিছু কিছু প্রবন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ সংকল্পের বৈশাখ ১৩৬১ সংখ্যায় 'সংকল্পের কথা' সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটিতে স্বাধীনতার সন্তান বলেছিলেন। তারই সূত্র ধরে তিনি নিজেই আষাঢ় ১৩৬১ সংখ্যক সংকল্পে 'শ্রীদিক্ষিত' ছদ্মনামে 'স্বাধীনতার কথা শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার অতুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের পক্ষে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশে দেশে যুদ্ধপ্রিয় জবরদস্তেরা যেমন আছে তাদের চাইতে বেশী সংখ্যায় আছে শান্তি ও মৈত্রীপ্রিয় জনগণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই বহুদেশে তাদের অভ্যুদয় হয়েছে, যুদ্ধকে তারা জ্ঞান করেছে মানুষের জন্য অভিশাপ। আজ যখন দুই পক্ষের হাতেই আণবিক বোমা আদির মতো প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র তখন তাদের একমাত্র কাজ যুদ্ধ ঘটতে না দেওয়া।"[৩২] কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য তিনি শুধু যুদ্ধহীন অবস্থাই কামনা করেননি, নেতার ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য তার প্রতি জনগণের সমর্থনকেও তিনি বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেননি। তাঁর মতে সজাগ বিরোধিতাই একটি দেশের কলুষ মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সচেতনতা ভারতীয়

সমাজে থাকলেও আচার প্রাধান্য বৃহত্তর সমাজ-জীবন গঠনের অন্তরায় হয়ে আছে। রাজনীতি সে বিচ্ছিন্নতা দূর না করতে পারলেও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান অনেকখানি সফল হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর করা স্বাধীন ভারতের জন্য এখনও প্রয়োজনীয় (পৃষ্ঠা-৪)।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কাজী ওদুদ ওই কথাগুলো বলে থাকলেও আমরা দেখেছি ১৯৮০-র পুরো দশকটিও ভারতের রাজনীতি অস্থির অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওই সময় হিন্দু-শিখ বিরোধ তুঙ্গে উঠেছিল এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৪ সনে শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ২০০২ সনেও ভারতের গুজরাটে হিন্দু-মুসলমানের এক ব্যাপক দাঙ্গা হয়ে গেছে। কাজী ওদুদ ভারতের উন্নতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন সমিতি, গ্রামরক্ষীদল গঠন করা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বিগত শতাব্দির পঞ্চাশের দশকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বল্‌লে, কাজী ওদুদ ভারতের ওই সব কথিত সমস্যা সমাধান করার জন্য, এক কথায়ই সমাজতন্ত্র প্রচলনের পক্ষে মত প্রকাশ করতেন। তিনি তা করেননি। অন্নদা শঙ্কর রায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শিথিলতা অনুভব করতেন। ভারতে খুব শীঘ্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না তা তিনি ওই সময়ই জানতেন। কাজী ওদুদ সমাজতন্ত্রের প্রত্যাশী ছিলেন না।

ভারতের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে যে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, এবং সে জন্য যে, দৃষ্টান্তশীল মানুষকে অনুসরণ করা কর্তব্য, সে কথা বলতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ আচার্য বিনোবাজী, মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের খাদ্যমন্ত্রী কিয়োদাইর কথা স্মরণ করেছেন। রফিক আহমদ কিয়োদাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে। সে সংগ্রামের প্রশ্নে তাঁর চরিত্রের শিথিলতা দেখা যায়নি। ওই সংগ্রামে তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তিও বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

বিনোবাজী গান্ধীজীর অনুসারী হলেও, তিনি ভূ-দান নীতি চালু করেছিলেন। তিনি মূলত: গীতা ও কোরানের অনুসরণে ধনীর সম্পত্তি সমাজের জন্য দান করার নীতি চালু করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "উপার্জিত ধনসম্পত্তি উপার্জকেরই নয়, সবার, কাজেই সবাইকে তাঁদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে তবে উপার্জক তাঁর উপার্জন ভোগ করতে পারে।"[৩৩] "কিন্তু বিনোবাজীর আসল বক্তব্য, তিনি চান মানুষের

দায়িত্ব বোধের বিকাশ, রাষ্ট্রের বা আর কারো নির্দেশে সে যে কাজ করবে তা নয়. কেননা সে ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে তার বিকাশ-সাধন হবে না, তাই প্রকৃত কল্যাণও লাভ হবে না।"[৩৪]

বিনোবাজীর আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতের অন্তরে নতুন চেতনার সঞ্চার করতে পেরেছেন বলে তাঁকে মানুষের কল্পনার সন্তান বলে অভিহিত করে বিনোবাজীর আদর্শ ভারতে ও জগতে সার্থক হোক, কাজী ওদুদ এই কামনা করেছেন। তিনি মহামানবের চরিত্রের প্রতি সর্বদাই অনুগত ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ব্যক্তি চরিত্রের ও ব্যক্তিগত জয়ের চেয়েও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জয়– অন্তত কাজী ওদুদের জীবৎকালে– তাঁর দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে গেছে। আমাদের মনে হয়, আজকের পৃথিবীতে ব্যক্তিচরিত্রের মহিমার প্রতিষ্ঠার চেয়ে সামাজিক আদর্শের বাস্তবায়নের চেষ্টাই বিশ্বকল্যাণের জন্য প্রয়োজন।

সমাজ, সংস্কৃতি ও পরিবার নিয়ে আরও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'সংকল্প' পত্রিকায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬১ সংখ্যা ও ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বর্ষ শেষ সংখ্যায় মোতাহের হোসেন চৌধুরীর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একটির নাম 'সংস্কৃতি কথা' অন্যটির নাম 'রিনেসাঁস: গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি'। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম উপায় হচ্ছে যৌনতৃপ্তি। যৌনতৃপ্তির উপায় কামকে প্রেমের সঙ্গে যুক্ত করা। শুধু কামে তৃপ্তি নেই, তা পরিণামে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে আসে। প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েই কাম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর হয়ে উঠে। অথচ সমাজ বিয়ের দ্বারা কামের দ্বার খোলা রাখলেও প্রেমের দ্বারটি বন্ধ করে দিয়েছে" (পৃষ্ঠা-৬)। তিনি আরও বলেছেন যে, অবিবাহিত নরনারীর সান্নিধ্য ও চুম্বন জাতীয় ঘনিষ্ঠতায় সমাজ আপত্তি করে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। কিন্তু তাতে করে সমাজের কাঠামো তথা সমাজপতিদের জেদ বজায় থাকে কিন্তু মানুষ প্রেমহীন হয়ে উঠে। এবং ধর্মের নামেই এসব করা হয়ে থাকে, (দ্র:পৃ.-৭)। কিন্তু লেখকের মতে : ধর্ম মানুষকে যতখানি বিকশিত করে, কালচার মানুষকে তার চেয়ে বেশি বিকশিত করে। কালচার্ড হতে গেলে আইডিয়ার গোঁড়ামী থেকে মুক্তি হল তার প্রধান শর্ত। এবং আইডিয়ার গোঁড়ামী থেকে মুক্তি পাবার উপায় হল নিজের বা নিজের দলের অভ্রান্ততা বিষয়ে একটু সন্দেহ রাখা।'

মোতাহের হোসেন চৌধুরী এ বক্তব্যের দ্বারা ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬-১৯৩৮) একজন কর্মী হিসেবে নিজের দায়িত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছেন। লেখক বৃটিশ পরবর্তী যুগের আমাদের সমাজের ও মানুষের আচরণ ও ইতিহাস

চেতনার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি 'রিনেসাঁস: গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি' প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি বাঙালী সমাজের রেনেসাঁর ঐতিহাসিক পটভূমিসহ আমাদের বর্তমান দায়িত্বের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক সমাজে রেনেসাঁসের সাধনা করা খুব কঠিন; রেনেসাঁসের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রয়োজন খুব বেশি। এবং অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় নয় বলে মানব সভ্যতা বার বার ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু অর্থনীতিকে মানুষ বার বার নিজের প্রয়োজনে লাগাতেই তৎপর। এর মূলে রয়েছে, ব্যক্তির বুদ্ধিকে নিজের প্রয়োজনে লাগানোর প্রবণতার মধ্যে। অথচ মানুষের উচিৎ নিজের বুদ্ধিকে সমাজের প্রয়োজনে লাগানো উচিত। তাহলেই পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে। আমাদের সে চেষ্টাই করা উচিত।

ব্যক্তির কুপমণ্ডুকতা ভাঙ্গাই মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। তিনি মানব চরিত্র, ধর্ম ও সমাজের অধিকারভুক্ত বিষয়গুলোকে আলোচনা করেছেন মনস্তত্ত্বের আলোকে। তাই তার প্রবন্ধগুলো মানুষের হৃদয় সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং এজন্যই তা পাঠকের কাছে আদৃত হয়েছে। তাঁর "স্নেহ মমতা ভালবাসা" (সংকল্প, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬১), এবং "পরিবার ও সুখ" (শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৬১) প্রবন্ধ দুটি মনস্তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। এবং দুটিই ইংরেজি প্রবন্ধের আলোকে লিখিত। মূল প্রবন্ধের নাম ও মূল লেখকের নাম থাকা দরকার ছিল। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও লেখক প্রবন্ধের মাঝে মাঝে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে প্রবন্ধ দুটিকে আমাদের সমাজের পরিবেশের সঙ্গে একীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের সমাজে পরিবার ও মনস্তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ বেশি নেই। সেদিক থেকে স্বল্প পরিসরে হলেও 'সংকল্প' পত্রিকার মাধ্যমে কাজী আবদুল ওদুদ, বিংশ শতাব্দির পঞ্চাশের দশকে, ওই জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে একটি বড়ো কাজ করেছেন বলে আমাদের ধারণা।

'আমাদের কালের গণসাধনা' (সংকল্প, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৬১), প্রবন্ধে মাহবুব-উল-আলম আমাদের সমাজে সুরুচি ও মানবিক সাধনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দিকটি তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রতি আমাদের আচরণ যে, সহজেই মধুর ও মানবিক করে তুলতে পারা যায়, লেখক সেকথাই বলেছেন ওই প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও বলেছেন যে, আমাদের সমাজে লেখক তথা সংস্কৃতিসেবি এমনও ব্যক্তি আছেন, যাঁরা চাকরকে খাটায় শাহী মেজাজে এবং সারা রাত রুশীয় সাহিত্য অনুবাদ করেও সকালে আয়েস আয়োজন চলে সমান্ত জমিদারের মত এবং অফিসে গিয়ে দেদার ঘুষ খান।' লেখক এ বক্তব্যে আমাদের সমাজের সৃজনশীল বলে কথিত মানুষদের ভেতরের ফাঁকটি ধরতে পেরেছিলেন। বিগত

শতাব্দির পঞ্চাশের দশকে কথিত অবস্থা থেকে আমাদের লেখক সমাজের ভেতরের ওই জাতীয় ফাঁক ভরাট হয়েছে, এমন কথা আমরা বলতে পারি না। এবং এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সেবকের ওই জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমাদের বাংলাদেশের সমাজে লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের মাধ্যমে তরুণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ব্যক্তিদের চরিত্রের ঘৃণ্য দিকটি উপেক্ষা করে আসতে চেষ্টা করেছিলেন। আজ আবার ওই জাতীয় প্রবীণরাই ওই লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের জন্য সেকালের তরুণদের স্তুতি গাইছেন।

আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসের রেশ ধরে লেখা আবুল ফজলের "বুদ্ধির মুক্তি-বাদ ও আবুল হুসেন" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সংকল্পের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৬১); এবং বর্ষশেষ সংকলন ১৩৭২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথা"। বুদ্ধির মুক্তির কথা মূলত মুসলিম সাহিত্য সমাজেরই মূল্যায়ন করা। আবুল ফজলের এ-মূল্যায়ন তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়নি বলে আমাদের ধারণা। সাহিত্য সমাজের মূল্যায়নের জন্য সাহিত্য সমাজের সমকালে (১৯২৬-১৯৩৮), সমাজের বিভিন্ন বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতায় মোহিতলাল মজুমদার, স্যার এ, এফ, রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন, শামসুল হুদা, প্রমুখ যতটা আলোচনা করেছেন আবুল ফজলের আলোচনা তার চেয়ে বেশি কোনো দিকের প্রতি আলোকপাত করতে পারেনি। তবে 'সংকল্প' কাজী আবদুল ওদুদ এবং প্রবন্ধ দুটির লেখক আবুল ফজল মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলে, রচনা দুটির তথ্যগত মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবুল ফজল তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, মুসলিম সাহিত্য সমাজ আন্দোলনের ভাবযোগী ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, এবং কর্মযোগী ছিলেন আবুল হুসেন। অপরপক্ষে কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন যে, আবুল হুসেনের ওপরে আন্দোলন গড়ে তোলার ভার পড়েছিল যেমন, তেমনি সমাজের পেছনে যে-চিন্তাধারা কাজ করেছে তাতেও আবুল হুসেনের একটা বড়ো অংশ ছিল (সংকল্প, বর্ষশেষ সংকলন, ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৩৪)। বুদ্ধির মুক্তিবাদ শুধু ঢাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছেন:

"অল্পসময়ের মধ্যেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হলো; শুধু ঢাকায় নয়, কলকাতায়ও—কলকাতায় 'বুদ্ধির মুক্তি' ও উদার মানবিকতার বাহন হল সওগাত, এবং অনেক রচনা প্রকাশ করেন। সে সবের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গরচনা "আয়না" বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছে"– (সংকল্প, বর্ষশেষ সংখ্যা ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৩৯।)

সংকল্প পত্রিকা সমাজ ও প্রগতি বিষয়ে বহুসংখ্যক রচনা প্রকাশ করলেও, নান্দনিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধও প্রকাশ করেছে। আবুল ফজলের 'কথাসাহিত্যের কথা' (৭ম-৮ম সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১), এম, আবদুর রহমানের 'পল্লীকবি আহম্মদ হোসেন (৭ম-৮ম সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ন, ১৩৬১), এবং সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'অহমিকা-সৌন্দর্যচেতনা-রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে (৯ম-১২শ সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬১)। আবুল ফজল বাংলা কথা সাহিত্যের প্রগতি আলোচনা করতে গিয়ে এর বাস্তবতার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি আমাদের একদল ঐতিহ্যপ্রীতির বিভ্রান্তির আলোচনা করে বলেছেন, "পূর্ববঙ্গের পাঠকের কাছে ফোরাৎ দজলা বা বসফোরাস অপেক্ষা পদ্মা-কর্ণফুলি, বুড়িগঙ্গা অনেক বেশী সত্য, আরাফাতের মাঠ থেকে রমনার মাঠ অনেক বেশী প্রত্যক্ষ" (পৃষ্ঠা-৪০)। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, "সৌন্দর্যচেতনা, সমাজ-চেতনার উর্ধ্বে।.....কিন্তু সমাজচেতনাবাদীদের একথা বোঝানো সত্যিই কঠিন"।- (সংকল্প, ৯ম-১২শ সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬১, পৃষ্ঠা-৮)।

আমাদের সাহিত্য সমালোচনায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুসারীরা ইতিহাসের কাল-সচেতনতা বিসর্জন দিয়ে একজন সামন্তবাদী বা বুর্জোয়া সাহিত্যিককে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টির মাধ্যমে বিচার করে যে ভুল আক্ষেপ প্রকাশ করেন, ওপরে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ এ জাতীয় বিভ্রান্তিতে পড়েননি, -তা ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন বক্তৃতায় দেখা গেছে।

'সংকল্প' পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল এর 'যা ঘটছে' নামক সম্পাদকীয় বিভাগ। এ বিভাগে সমকালীন ঘটনা প্রবাহকে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করার চেষ্টা করা হত। এই বিভাগে যে চল্লিশটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে পাকিস্তান ও ভারত, বিশেষ করে, পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সম্পর্ক একটি বড়ো স্থান করে নিয়েছিল। তাতে রয়েছে, ১৯৫৪ সনে পাকিস্তানের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, মুসলিম লীগের পতন, পাকিস্তানী রাজনীতির গতিধারা, ফজলুল হক মন্ত্রী সভার বিলোপ ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণ। আরও ছিল বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্মের মূল্যায়ন।

প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৬১), পূর্ববঙ্গের নির্বাচন বিষয়ে বলা হয়েছে: নির্বাচনে (১৯৫৪) পূর্ব পাকিস্তানের সাফল্য হলেও তা আংশিক সাফল্য, কিন্তু সুনিশ্চিত।' সেই নির্বাচনে বিজয়ী দলের প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করা হলে সংকল্পে মন্তব্য করা হয়েছে যে, নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রীকে এভাবে পদচ্যুত করে, নতুন নির্বাচন না দিয়ে এমনকি যুক্তফ্রন্ট ফজলুল হক ব্যতীত আর কাউকে মন্ত্রী নির্বাচন করতে রাজি আছে কিনা তা যাচাই না করে, তাঁর পদচ্যুতির মাধ্যমে

প্রবল স্বৈরতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছে। এবং বাংলাভাষী ও উর্দভাষীদের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর করা হল।'- (সংকল্প, আষাঢ়, ১৩৬১; পৃষ্ঠা-৪৪)। উর্দুভাষী মানুষদের সঙ্গে বিরোধ যে তীব্রতর করা হয়েছিল, তা পরে প্রমাণ হয়েছে পাকিস্তান ভেঙ্গে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টির মাধ্যমে।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেলের শাসন প্রবর্তিত হলে সংকল্প পত্রিকা মন্তব্য করেছে: এ জাতীয় সংকট শুধু পাকিস্তানেই নয়. সকল মুসলিম রাষ্ট্রেই দেখা দিয়েছে।[৩৫] পত্রিকা যতটা গুরুত্ব দিয়ে পাকিস্তান বিষয়ে মন্তব্য করেছে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকায়, ভারত রাষ্ট্র বিষয়ে মন্তব্য করেছে তার তুলনায় অনেক কম পরিমাণে। ভারত বিষয়ে প্রকাশিত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে, প্রয়োগের কুম্ভমেলার অব্যবস্থাপনা. পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান, পশ্চিম বঙ্গে ধান সংগ্রহ বিষয়ে অব্যবস্থাপনার সমালোচনা। এগুলো প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার যথাক্রমে ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৯ম-১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৬১ এবং বর্ষশেষ সংখ্যা ১৩৭২ সংখ্যায়।

কাজী আবদুল ওদুদ প্রথম বয়সে যে কর্মতৎপরতার সঙ্গে, মুসলিম সাহিত্য সমাজের সহমর্মী কর্মীদের সহযোগে যতখানি সফলভাবে কাজ করতে পেরেছেন, শেষ বয়সে ততখানি সফলতার সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতে পারেননি। তবে তাঁর চেষ্টায় আন্তরিকতা ছিল। পত্রিকা সম্পাদনে এটিই বড়ো অবদান।

তথ্যসঙ্কেত

১। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম. খোন্দকার সিরাজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৮৪; পৃ: ৩০৬-৩০৮।

২। খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৮।

৩। দ্রষ্টব্য ঃ (প্রবন্ধ: "কাজী আবদুল ওদুদ এবং মুসলিম সাহিত্যসমাজ"; (গ্রন্থ: অনূদিত সাহিত্যতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধ, আহমদ নুরুল ইসলাম. জাগৃতি প্রকাশনী. আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ: ২০০২, পৃষ্ঠা-৭-২১।

৪। কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী, আবদুল হক, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৯০; পৃষ্ঠা-৮।

৫। 'কাজী আবদুল ওদুদ'' লেখক; আবদুল কাদির বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, দ্বিতীয়–তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা-৫৩।

৬। 'কাজী আবদুল ওদুদ': আবদুল কাদির, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৭৯ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪।

৭। পত্রিকাগুলো আমি নিজেই. ১৯৮৫ সনে কাজী আবদুল ওদুদের কন্যা জেবুন্নেসার (ঢাকা শহরের ঝিগাতলা) বাসায় দেখেছি।

৯। সঙ্কল্প, বৈশাখ, ১৩৬১।

১০। 'জীবন কথা' (প্রবন্ধ): মেহেরুন্নেসার জীবন ও কাব্য সংগ্রহ (গ্রন্থ), সম্পাদক: অধ্যাপিকা হাফিজা বেগম: প্রকাশক: বি. এম, নোয়াব জাকারিয়া, ২১৫/১, শান্তিবাগ, ঢাকা; পৃষ্ঠা-৩।

১১। 'কবিমানস ও কাব্য শিল্প' (প্রবন্ধ): আহমদ নূরুল ইসলাম; "মেহেরুন্নেসার জীবন ও কাব্য সংগ্রহ" (গ্রন্থ); অধ্যাপিকা হাফিজা বেগম: প্রকাশক: বি, এম, নোয়াব জাকারিয়া, ২১৫/১, শান্তিবাগ, ঢাকা; পৃষ্ঠা-১৩।

১২। 'জীবন কথা' (প্রবন্ধ); মেহেরুন্নেসার জীবন ও কাব্যসংগ্রহ (গ্রন্থ), অধ্যাপিকা হাফিজা বেগম; প্রকাশক: বি, এম, নোয়াব জাকারিয়া, ২১৫/১, শান্তিবাগ, ঢাকা: পৃষ্ঠা-২-৩। (এ-বিষয়ে কবি কাজী রোজী বিশেষভাবে অবহিত আছেন।)

১৩। সংকল্প, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৪। ঐ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

১৫। ঐ, ১ম বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা, ১৩৬১।

১৬। ঐ, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬১।

১৭। সংকল্প, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬১।

১৮। ঐ, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬১।

১৯। 'নদীবক্ষে' প্রথম প্রকাশ, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯১৯। আজাদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩০ (পত্রিকায়); গ্রন্থাকারে প্রকাশ, নূর লাইব্রেরী, ১৯৪৮।

২০। সংকল্প, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

২১। ঐ, বর্ষশেষ সংকলন, ১৩৭২।

২২। ঐ, ঐ, ঐ।

২৩। সংকল্প, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬১।

২৪। 'আবুল ফজলের গল্প' (প্রবন্ধ); ড: খালেদা হানুম, 'পাণ্ডুলিপি' (পত্রিকা), বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ষোড়শ খণ্ড, ১৯৯৫; পৃষ্ঠা-৬৬।

২৫। ড. খালেদা হানুম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

২৬। ড. খালেদা হানুম, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

২৭। সংকল্প, আষাঢ়, ১৩৬১।

২৮। ঐ, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৬১।

২৯। সংকল্প পত্রিকায় 'পলৌবা' নামের পাঁচ অঙ্কের একটি নাটকও প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক: আবদুর রাজ্জাক; প্রকাশকাল: জ্যৈষ্ঠ-১৩৬১-কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১। এবং চিত্তরঞ্জন হালদারের "ভাগ্যহীন" নামের বড় গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল, বর্ষশেষ সংখ্যায়-পৌষ-চৈত্র, ১৩৬১ সংখ্যায়।

৩০। 'আমাদের ভবিষ্যৎ'- সংকল্প, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৬১, পৃষ্ঠা-১১।

৩১। ওই, পৃষ্ঠা-১২।

৩২। সংকল্প, আষাঢ় ১৩৬১, পৃষ্ঠা-৩।

৩৩। সংকল্প, আষাঢ় ১৩৬১, পৃষ্ঠা-৭।

৩৪। ওই, পৃষ্ঠা-৮।

৩৫। সংকল্প, ৭ম-৮ম সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা-৭৩।